দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 JUL 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 6 ... কলাম ... 3 ...

২২শে আষাঢ় ১৩৯৪বাং

090

দৃশ্যপট

— চারুনেত্র

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারের পূর্ব অনুমতি ছাড়া ছাত্র বেতন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ফি না বাড়ানোর জন্যে সরকারী অনুদান গ্রহণকারী বেসরকারী স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে।

১৯৮৭-৮৮ সালের বাজেটে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র বেতন প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ সেই সুযোগটিই কোনো কোনো বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ নিতে চাচ্ছেন। ১ জুলাই থেকে কিছুসংখ্যক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফি বাড়ানোর খবর পাওয়া গেছে। সংবাদটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরও কর্ণগোচর হওয়ায় এ নির্দেশ দান করা হয়েছে।

সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি অভিভাবক ও ছাত্ররা ঠিক পছন্দ করেনি। কারণ হঠাৎ ছাত্র বেতন দ্বিগুণ করার ফলে বহু অভিভাবকের পক্ষেই বাড়তি খরচ যোগাতে কিছু কষ্ট স্বীকার করতে হবে। তবে এটা সত্য যে, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিনষ্ঠানগুলোর মধ্যেকার ছাত্র বেতন এবং অন্যান্য ফি'র ব্যবধান অনেক বেশী। এমনকি বর্তমানে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন বাড়ানো হলেও তা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতনের ধারে-কাছেও যেতে পারেনি।

প্রাইভেট স্কুল-কলেজগুলোতে সবসময়ই বেতন ও অন্যান্য ফি বেশী নেয়া হয়। প্রয়োজনীয় খরচ মিটানোর জন্যেই বেশী বেতন ও ফি নেয়া হয় বলে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বদা অজুহাত দেখায়। অথচ অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুদান পেয়ে থাকে। সম্প্রতি এই অনুদানের পরিমাণ আরো বাড়ানো হয়েছে। তবু যেনো এদের খাই মিটছে না। আর তাই চট করে কোনো কোনো বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেতন ও আনুসঙ্গিক ফি বাড়িয়ে দিয়েছে।

বর্তমানে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করানোর জন্যে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয় তা সংগ্রহ করতে অভিভাবকদের হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। কাগজ, কালি, কলম, বই-খাতা সবকিছুই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। এর উপরে বেসরকারী স্কুল-কলেজের চড়া বেতন এবং নানারকমের ফি'র চাপে অভিভাবকদের মেরুদণ্ড নুয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় আবার যদি বেতন বৃদ্ধির খড়গ তাদের মাথার উপরে ঝুলতে থাকে তাহলে, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ ছাড়িয়ে এনে হয়তো বাড়ীতেই বসিয়ে রাখতে হবে।

শুনে আশ্চর্য হতে হয় যে, রাজধানী-নগরী ঢাকার বেশ কিছু বেসরকারী স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি এক। এখানকার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের প্রতিমাসে শুধু টিউশন ফি দিতে হয় একশ' টাকা। এ ছাড়া অন্যান্য ফি তো আছেই।

আমাদের দেশে যেসব ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করে তাদের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত পরিবারের।

নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও খুব কম নয়। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি এভাবে শুধু বেতন বাড়াতে থাকে তাহলে তাদের অনেকেরই লেখাপড়ার সাধ যে শিকেয় উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম। তাছাড়া এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক। তাই সাধ থাকলেও অনেকের পক্ষেই সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সাধ্য হয় না। তখন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই যেতে হয়। আর এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়েই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাঙ্গনের পবিত্র পরিবেশকে আড়তদারী ব্যবসার পরিবেশে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, বর্তমানে প্রাইভেট স্কুল-কলেজগুলোকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না বলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলাই উচিত। রাজধানী ঢাকা থেকে এই অশুভ প্রবণতা সারাদেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি গ্রামের স্কুলগুলোতেও ছাত্র বেতন অবিশ্বাস্যরকম বেড়ে চলেছে।

বেতন ও অন্যান্য ফি বাড়ানো হলেও বেসরকারী অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকমতো শিক্ষা দেয়া হয় না বলে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়। এ অভিযোগ যে মিথ্যা নয় তা অভিভাবকমাত্রই জানেন। শিক্ষকরা বর্তমানে প্রাইভেট টিউশনী নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকেন। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি নজর দেয়ার গরজ বোধ করেন না। চার-পাঁচ জনের এক একটি গ্রুপকে তারা প্রাইভেট পড়ান। বিনিময়ে আয় করেন বিপুল অর্থ। পরীক্ষায় পাস করতে হলে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট টিউটর না রেখে উপায় নেই

নিজের স্কুলের শিক্ষককে প্রাইভেট টিউটর রাখলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন রকম সুবিধা হয়। পরীক্ষার আগে সাজেশনতো পাওয়াই যায়, বহু ক্ষেত্রে সাজেশানের নামে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পরোক্ষভাবে ফাঁস করে দেয়া হয়। কিন্তু এর পরিণাম হয় খারাপ। স্কুলের পরীক্ষাগুলো ভালোভাবে পাস করলেও এসএসসি পরীক্ষার সময় এই টিউটার-নির্ভর ছাত্র-ছাতরীরা পড়ে বিপদে। পুরো বই না পড়ে সাজেশান অনুযায়ী কিছু কিছু অংশ পড়ে টেস্টে উত্তীর্ণ হয়েও তাদের অনেকেই এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারে না। এমনকি, এমন নজিরও আমি দেখিছি যে, স্কুলের প্রথম দশজনের মধ্যে প্লেস পাওয়া ছেলে এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্যই হতে পারেনি। কারণ তার প্রাইভেট টিউটারের সাজেশান অনুযায়ী সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি।

এ অবস্থায় আমি বিনীতভাবে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন রাখবো যে, আপনারা আর ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফি বাড়িয়ে অভিভাবকদের অসুবিধায় ফেলবেন না। পারলে বেতন ও আনুসঙ্গিক ফি হ্রাস করুন। সেই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন। শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনী নিরুৎসাহিত করুন।

শিক্ষকদের প্রতিও আমি এ অনুরোধ রাখবো যে, আপনারা স্কুলের ক্লাসগুলো ঠিকমতো নিন। যাদের সামর্থ্য আছে তারা প্রাইভেট টিউটার রাখলেও এমন বহু ছাত্র-ছাত্রী আছে যাদের পক্ষে এতো টাকা খরচ করে প্রাইভেট টিউটার রাখা সম্ভব নয়। ক্লাসে পড়াশোনা না হলে এদের গতি কি হবে?

প্রসঙ্গতঃ এখানে আর এক শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করতে হয়।

সাধারণতঃ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কিণ্ডার গার্টেন ও প্রিপারেটরী স্কুল নামে পরিচিত। প্রাথমিক শিক্ষা দানই এদের কাজ। কিন্তু বাস্তবে এরা শিশুদের যা শিক্ষা দেয় তা আদৌ আমাদের দেশের উপযোগী নয়। অন্যদিকে এসব স্কুলে ছাত্র বেতন ও অন্যান্য ফি অবিশ্বাস্যরকম বেশী। ক্লাসে শিশুদের তেমন যত্ন নেয়া হয় বলে শুনিনি। একগাদা বই পড়তে হয় তাদের। আর কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হয় বিপুল হোমওয়ার্কের বোঝা। বাড়ী থেকে যদি পড়া শিখে না আসে, যদি সব হোমওয়ার্ক করে না আসে তাহলে শিশুকে যেমন শাস্তি দেয়া হয় তেমনি অভিভাবকদেরও চিঠি লিখে বাড়ীতে ঠিকমতো পড়াশোনা করানোর পরামর্শ দেয়া হয়।

সেদিন একজন অভিভাবক আমাকে বললেন, স্কুলে যদি পড়াশোনা না হয়, সব যদি বাড়ীতেই করতে হয় তাহলে এতো টাকা খরচ করে আমরা বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাবো কেন? প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে প্রত্যেক অভিভাবকেরই মনের কথা।

প্রকৃতপক্ষে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলো নিছক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া কিছু নয়। এবং অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। একটা চার-পাঁচ কামরার বাড়ী নিয়ে একটা সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দিলেই কেল্লাফতে।

একটি বিদেশী মাসিক পত্রিকায় কিণ্ডার গার্টেন স্কুল সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক প্রতিবেদন পড়েছিলাম কিছুদিন আগে। প্রতিবেদক এক কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের মালিককে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, মালিক ভদ্রলোক মাড়োয়ারী। তিনি ঐ পত্রিকার প্রতিবেদককে জানান, তিনি ভূষা মালের ব্যবসা করতেন। কিন্তু কিছুতেই ব্যবসা জমাতে পারছিলেন না। সে সময় হঠাৎ তার মাথায় কিণ্ডার গার্টেন স্কুল শুরুর মতলব জাগলো। ছোটো একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দিলেন। কয়েকজন শিক্ষিকা নিয়োগ করলেন। আর বছর পাঁচেকের মধ্যেই তিনি ফুলে ফেঁপে উঠলেন।

আমাদের এখানেও মহল্লায় মহল্লায় পান-সিগারেটের দোকানের মতো যেভাবে কিণ্ডার গার্টেন স্কুল গজিয়ে উঠছে তাতে মনে হয় সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলো সম্পর্কে কিছু ভাবছেন কিনা তা আমার জানা নেই। তবে আমি মনে করি, এসব স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ব্যাপারে একটা নিয়ম চালু হওয়া উচিত। ইচ্ছে করলেই যেনো যে কেউ কিণ্ডার গার্টেন স্কুল চালু করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আরো লক্ষ্য রাখা দরকার এসব স্কুলের পাঠ্যসূচীর উপরে।